শুধু সাদা সাদা বরফ লেগে আছে গাছে

শ্রীময়ী ভট্টাচার্য

১.

প্রথম যখন সুনীলদার বাড়ি যাই, উনি আমায় একটাই প্রশ্ন করেছিলেন– 'প্রেম করেছ?' আমি বেশ ভাবনায় পড়ে গেছিলাম... মানে প্রেমে পড়েছি প্রচুর ঠিকই...কিন্তু প্রেমটা করেছি কি? উনি চুপ করে থাকতে দেখে হেসে বলেছিলেন– 'প্রথমে প্রেমটা করো, তা ভাঙুক, তবে না কবিতা লিখবে!'

কথাটা গেঁথে গিয়েছিল মাথায়। অথচ মহা সমস্যা... আমার প্রেমগুলো ভাঙেই না! খালি ইটর্নিটিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে আমার কবিতা লেখা হয়েও ওঠেই না কখনো।

আমি তখন বাঙ্গালোরে, নতুন শহর। প্রথম কলকাতার বাইরে এতদিন থাকা। একটু আধটু হোম-সিকনেস, সঙ্গে এইটুকু স্বাধীনতার হাওয়া! অথচ প্রেম নেই, প্রেম নেই, ভারী দুরবস্থা! অফিসে ভীষণ বোরিং পাব্লিক...না কোনো বাঙালী আছে, না কোনো বন্ধু...

আর এদিকে তখন আমি সবে এক ইটার্নিটি থেকে উঠে দাঁড়াবো দাঁড়াবো করছি...

হেনকালে হঠাৎই একদিন দূরদেশ থেকে এক ফোন এল... অনসাইটের ফোন, বান্দা ভারতীয়, অবাঙালী, এবং খ্রিস্টান। (খ্রিস্টানদের প্রতি আমার অজন্মা একটা টান, সেসব কারণ বলছি পরে।) আলাপ হল আচমকাই পিঙ্ক ফ্লয়েডের গান নিয়ে...কী...না, যখন কিনা ফোন করেছে, পাশে 'Green is the colour of her kind' চলছিল। ব্যাস, আর পায় কে? একে দক্ষিণে এমন কারোর সাথে আলাপ হয়নি যে কিনা ইংরাজি গান শোনে, তায় আবার...

যাক, তা হুট করে, মাত্র একটা ফোনেই প্রেমে পড়ে গেলাম। প্রেম তো আর বলে কয়ে আসে না।

আর সে সূত্রে আলাপ হল আরেক নতুন শহরের সাথে। ইংল্যান্ডের ইস্ট কোস্টে একটা ছিমছাম শহর। নাম নরউয়িচ...

দূরদেশী প্রেম হলে যেমনটা হয়... সন্ধে করে এলেই ফোন। কখন রাত আসে, যায়, বোঝার আগেই আলার্ম বেজে ওঠে... অফিসে ঢুলুনি, চোখের তলায় কালি –এসব ন্যাচারাল সিনড্রোম...

ওদেশে তখন গ্রীষ্ম, তাই সন্ধে ওদের হয়ই না...রাত ১১টা বাজে, তবু দিনের আলো... আমার অবাক লাগে, আর মনে হয় এমন আলোর শহর যখন, আমাদের দুজনকে বেশ মানাবে ওখানে...

আর আমি নিজের মতো করে ভাবতেও শুরু করে দিই... 'ওই যে বীচটায় তুমি গেছিলে আজ, আমরা ওখানটায় একটা ট্রি-হাউজ বানাব, কেমন? বীচটার নাম যেন কী? ওহ হ্যাঁ, ইয়ারমাউথ...

আর আমি, সাদা হরিণের মতো ছুটো ছুটে বেড়াব ওখানে... আর তুমি কালির পেন দোয়াতে ডুবিয়ে লিখবে 'She will be my heroine for all time... and her name will be Viala.'

ধীরে ধীরে ৩ মাস কেটে যায় কখন, বোঝাই হয়না... অনেক নতুন কিছু জেনে গেছি ততদিনে আমি... ঐ দেশের কথা। (দেড়শো বছর হয়ে গেলেও, ব্রিটেনের ব্যাপারে কৌতূহল কিন্তু ভারতীয়দের এখনো প্রবল...) জেনেছি বলতে... যেমন ধরো, ইংরেজরা আসলে কেমন, কী খেতে ভালোবাসে... ইংলিশ ব্রেকফাস্টে কী কী করে... লাঞ্চে, ডিনারে ...ছুটির দিন কী করে...

এও জেনেছি, মাত্র ৩টে মাস ওরা সূর্য দেখে সেই অর্থে। ছোটবেলায় যেমন আমরা পড়তাম... সকালে উঠে বলতে হয় 'Wow! What a sunny day!' আর কিছুতেই বুঝতাম না, এতে এত আনন্দের কী আছে। আমাদের তো রোজই সানি ডে!

আসলে, ইংরেজিটা ওদের ভাষা বলেই এত কনফিউশন!

গ্রীষ্ম থেকে বর্ষা আসে, খুব বেশিদিন থাকে না... শীত নেমে আসে তার আগেই...

একটা কথা বেশ অবাক লেগেছিল শুনে... ক্রিসমাসের দিনটাতেই নাকি সবচেয়ে শান্ত থাকে ব্রিটেন, আমাদের থেকে অনেক অনেক বেশি শান্ত। আমি হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম...আরে...ক্রিসমাস তো ওদেরই!

কিন্তু ওরা নাকি তখন বাড়ি যায়...

বছরের ওই একটাই সময় ওরা বাড়ি ফেরে...

ওখানকার নাইট লাইফও বেশ হ্যাপেনিং! সারা দিন রাস্তাঘাটে লোক না দেখা গেলেও, রাত হলেই দঙ্গল আমাদের বয়েসি ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় করে। আর ওদেশী মেয়েরা যা সুন্দর! আর ওখানে নাকি মদের দাম জলের দামের প্রায় সমান। তো স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অফিসের সব বন্ধুরা দারুণ উত্তেজিত হয়ে শুক্রবার রাত্রি হলেই বেরিয়ে পড়ে...আমি হলেও তাই করতাম...

কিছুদিনের মধ্যেই একটা চনমনে খবর পেলাম আমি...

দু-হফতার ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছে আমার প্রেমিকাটি...

এমন কি তার গত প্রেমিকাও..

দেখা হলো, দেখা হয়েও হলো না আর।

আমি ছোটোবেলা থেকেই শীতকালকে খুব ভয় পাই...কেন জানিনা। 'আর ভয় ধরলে, তাকে ওলাউঠা আগে ধরে'। আমাদের দুই দেশের মধ্যে সময়ের দূরত্ব বাড়ে ধীরে...অসময়েরও...

আমাদের সন্ধে নামে একসাথে...নিঃশব্দে...

কী করে যে সেই তিন-চার মাস কাটে, এখন আর মনে পড়ে না...তারপর একদিন আমারও ডাক পড়ে ঐ শহরে...

ঐ বীচের ধারে ঠিক যেখাবে ডেভিড কপারফিল্ড জন্মেছিলেন, তারই আশেপাশে কোথাও...একটা অদ্ভুত ইলিউশনের মধ্যে দিয়ে আমি...এই শহরটায় উড়ে আসি।

পোস্টিং –ইংল্যান্ডের ইস্ট কোস্টে ছিমছাম একটা শহরে। নাম –নরউয়িচ!

পৌঁছলাম যখন তখন প্রায় রাত। রোববার।

যেরকম ছোটোবেলায় ড্রয়িং পরীক্ষার আগে, মা জোর করত বলে, ঘর-বাড়ি আঁকতাম আমরা, যেমনটা আসলে কখনো দেখিনি... ঠিক তেমনই একচালা বাড়ি চর্তুদিকে। সব বাড়ির একই বরং –লাল। ইঁটের রং।

রূপকথার মতো সুন্দর রাস্তা। যেমন একটা ছবির উপর দিয়ে হাঁটছি। তাতে ধুলো নেই, ধোঁওয়া নেই। কেউ নেই।

চড়াই-উতরাই সুনসান রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি যায় আর আসে। তাও খুব কম।

হয়তো রাত বলে...

পরদিন ভোরে উঠে দেখলাম, আমার বাড়িটার ঠিক পিছনদিকেই একটা বিশাল মাঠ... অনেক বাচ্চা খেলতে আসে ওখানে... আর অনেক গাছ-গাছালি। আর সবেরই একটা ভীষণ সতেজ সবুজ রং। এই সবুজটা আমি কখনো এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না...

আমার অফিসপাড়াটা শহরের মাঝখানেই। বিশাল মাপের একটা অফিস। লোক যদিও অনেক কম বাঙ্গালোরের তুলনায়।

সবাই খুব পরিপাটি। এখানকার লোকদের, বিশেষত মেয়েদের ড্রেসিং সেন্স বেশ অন্যধরনের।

নিজের ফ্লোরে ঢুকতেই সব পুরোনো কলিগদের সাথে দেখা হল, যাদের অনেককেই শুধু দূরভাষে চিনতাম। এখন অবশ্য ফেসবুকের জমানায় মুখ চিনতে অসুবিধে হয় না। এখানকার ক্লায়েন্টেরাও বেশ ফ্রেন্ডলি। বেশ ভালো ওয়েলকাম করল।

শুধু বাকি রইল একজনের সাথে দেখা হওয়া...

'দেখা হল।

দেখা হয়েছিলা

না দেখার অনেক গভীরে...'

একটা সপ্তাহ কাজের চাপেই কেটে গেল। সন্ধে ৬টা অবধি অফিস। আর দোকানপাট সব বন্ধ সাড়ে ৪টের ভেতর। আর তারপর গোটা রাস্তা ফাঁকা...ফলে কিছুই দেখা হল না। উইকেন্ডে অবশ্য শনিবার সব খোলা থাকে সাড়ে ৭টা অবধি। বেরোলাম বন্ধুদের সাথে...

ছোট্ট শহরের ঠিক মধ্যিখানে একটা বেশ উঁচু দুর্গ। ১০৬৬ সালে নর্ম্যান'রা এই শহরে আসে এবং ঘাঁটি গাড়ে। তারাই প্রথম এই দুর্গ তৈরি করতে শুরু করে। এবং কাজ শেষ হতে হতে ২০০ বছর লেগে যায়।

এটা এই শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত ট্যুরিস্ট স্পটের মধ্যে অন্যতম– এখন একটা সমৃদ্ধ আর্ট গ্যালারি এবং আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম। এত পুরানো রাজাদের আমালের সব জিনিসপত্র... অথচ এত ওয়েল-মেন্টেন্ড... দারুণ লাগল দেখে। এছাড়াও এখানে সারা বছর কিছু না কিছু আর্ট একজিবিশন চলতেই থাকে। ব্রিটিশ ন্যাশনাল গ্যালারি থেকেও অনেক শিল্পীরা আসেন এখানে। পরে জেনেছি, একটা সময়, নরউয়িচ লোকসংখ্যায় এবং সমৃদ্ধিতে ব্রিটেনের মধ্যে দ্বিতীয় ছিল।

দুর্গটাকে কেন্দ্র করেই সিটি সেন্টার। অর্থাৎ, শপিং মল, রেস্তোঁরা, এমনকী হকার কলোনিও। শনি-রোববার বেশ রং-চঙে থাকে রাস্তাঘাট। যদিও লোকের সংখ্যা আমাদের ক'ভাগের একভাগ গুণে বলতে হবে আমায়।

পুরো শহরটা এতটাই পাহাড়ী, যে শপিং মলের ৩-৪ তলার সব এন্ট্রাস দিয়ে বেরোলেই রাস্তায় বেরোনো হয়। প্রথমে ব্যাপারটা হজম হতে সময় নিলেও বেশ মজার লেগেছিল আমার।

প্রতিটি রাস্তার মোড়েই, একজন - দুজন বসে গান গায়। গীটার হাতে। কিছু চেনা গান, কিছু অচেনা... মাঝে মাঝে একদল থেমে গিয়ে ওদের গান শোনে, পয়সা দেয়, আবার যে যার মতো শপিং করতে চলে যায়...

আর, এই সিটি সেন্টারই এখানকার সব আন্দোলনের পীঠ বলা যায়। কোনো প্রতিবাদ করতে হলে, ছাত্র-ছাত্রী বা যুবক-যুবতীরা এসে এইখানে ভিড় করে। গান গায়। তাঁবু বানিয়ে সারারাত থাকে। কখনো - সখনো মিছিলও করে... এদেশেও আন্দোলন হয়?

দেখেই কেমন যাবদপুর ইউনিভার্সিটির মাঠ মনে পড়ে গেছিল আমার! ইস্ কতদিন...

পরদিন রোববার। আগেই বলেছিল, আমার খ্রিস্টানদের খুব ভালো লাগে। আমার আসলে চার্চ যেতে খুব ভাল লাগে। ভাল লাগে ওদের শান্ত স্নিগ্ধভাবে প্রার্থনা করার ব্যাপারটা। এমনকী গাউন ব্যাপারটাও হেবি রোম্যান্টিক লাগে আমার!

এই শহরটার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ–নরউয়িচ ক্যাথিড্রাল। ১০৯৬ সালে প্রথম এর ফাউন্ডেশন স্টোন গাঁথা হয়। নর্ম্যানদের যুগে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর থেকেও এর চূড়াটা দেখা যায়। যদিও এই চূড়াটা তৈরি হয় পরে। ১৪৭২-১৫০১ সালের ভেতর।

চূড়াটা দেখলেই মনে হয়, যেন একটু মুখ সরু করে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। আর আকাশ আলতো করে হেসে বলছে, কিছু ভুল করেছিস বুঝি? থাক, কিছু হবে না। আর মন খারাপ করে না।

আমার অবশ্য যাওয়ার উদ্দেশ্য শুধু ক্যাথিড্রাল ছিল না। ভেবেছিলাম, রোববারের সার্ভিস তো খ্রিস্টানদের সবদেশেই মাস্ট! কিন্তু হল না সফল। কথা নেই মুখোমুখি অনেকদিন, তাই জানাও হল না কারণ...

আমি একাই ৯০০ বছরের পুরোনো পাথরগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলাম।

তারপর একটা সময় হঠাৎ বিশাল ঘরটার আলো নিভে গেল। লাইন করে দাঁড়ালো সবাই। আমিও। আর কিছুক্ষণ পর... মোমবাতি হাতে

দুজন ঢুকলেন। সঙ্গে এক দঙ্গল বাচ্চা। সবার হাতে মোমবাতি। হোলি কমিউনিয়ন। কোন একটা সিনেমায় দেখেছিলাম। সব ছোটো ছেলেরা স্যুটেড-বুটেড হয়ে আর ছোটো মেয়েরা সাদা গাউন পড়ে হেঁটে যাচ্ছে... সে এক দারুন দৃশ্য! মা-বাবার আনন্দে আপ্লুত নিজের ছেলেমেয়েদের দেখে... আর এদেশের বাচ্চারা যে ঠিক কী মিষ্টি... সামনে থেকে না দেখলে বিশ্বাস হয় না... পুরো পুতুল... আমি মুগ্ধ হয়ে দেখেই গেলাম ওদের।

ব্রেকফাস্ট করলাম পাশেই একটি অথেন্টিক ইংলিশ রেস্টুরেন্টে। ডিম, মাশরুম, বেকন, সসেজ আর বানরুটি! জাস্ট অসাধারণ! এরকম ফিলিং ব্রেকফাস্ট খেলে আর লাঞ্চ লাগে?

ফেরা পথে একটা শান্ত নদীর সাথে দেখা হল আমার... সত্যিই পটে আঁকার মতন...

সিনেমায় দেখেছি, ইউরোপের একটা সিগনেচার – এখানে নদীর উপর আর্চ করা ব্রিজ থাকে। এখানেও তাই। আমি অবশ্য নীচেই নদীর একপারে গিয়ে বসলাম। এখানে কেউ নেই যার জন্য তোমায় উঠে চলে যেতে হবে একটু পরেই... সবাই নিজের মতো, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অনেকক্ষণ বসে রইলাম একা... সন্ধে হয়ে আসছে দেখে উঠলাম। নতুন শহর...

তারপর হঠাৎ কবে যে পুরোনো হয়ে গেল, বুঝতেও পারলাম না...

একদিন হঠাৎ খবর এল, আমার প্রেমিকাটির বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। তাই অফিসে সবাই পার্টি চায়।

সামনাসামনি দেখা হলেও এড়িয়ে যাওয়াটা সয়ে গেছিল ততদিনে...অফিস জীবনে যা হয়...

পার্টির জন্য ঠিক হল, কোনো ইন্ডিয়ান রেস্তোঁরার যাওয়া হলে। ক্যাথেড্রালের কাছেই একটা রেস্তোরায় যাওয়া হল... 'স্পাইস ইন্ডিয়া'। ঢুকতেই কথার আদল দেখে বুঝলাম—বাঙালী! ব্যস, আমি তো ডগমগ! আলাপ হল ওয়েটারদের সাথে। কত দিন পর... একটু নিজের ভাষায় কথা হল। জানলাম, সবাই বাংলাদেশের। এখানে নাকি একটা সময়ে সিলেট থেকে অনেকে চলে আসে... প্রায় ১০০টা পরিবার এখন রয়েছে এখানে। অনেক আড্ডা মারলাম। বেরোনোর পর আবার নামটা দেখলাম রেস্টুরেন্টটার...ইন্ডিয়া কেন? কলিগরা বলল... সারা ব্রিটেন জুড়ে যত বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট আছে, তাদের বেশিরভাগই নামে 'ইন্ডিয়া' থাকে। মন ভালো হয়ে গেল শুনে... তাহলে মনে মনে ওরা এখনও নিজেদের আমাদেরই অংশ মনে করে!

দিনটা শনিবার। তাই কারোরই শুধু ইন্ডিয়ান খাবারে পেট ভরল না। ঠিক হল, নাইট আউট করা হবে। প্রিন্স ওয়েল'স রোডে। এটাই এই শহরের সবচেয়ে হ্যাপেনিং জায়গা। ওখানে পৌঁছে তো আমি তাজ্জব। একটার থেকে একটা মেয়ে সুন্দরী... হলিউডে যাওয়ার মতো। তার যে লেভেলে ড্রেস পরেছে। কাকে ছেড়ে কাকে দেখব ভেবে পেলাম না। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বেশ ভজঘট জামা-কাপড় পড়ে আছে। মানে ঠি গো-অ্যাজ-ইউ লাইক-এ আমরা ছোটবেলায় যেমন সাজতাম, সেরকম। বাকিরা জানাল, এটা থিম - বেসড পার্টি... বুঝলাম আর মনে মনে ভাবলাম, কেন যে ছেলেগুলোর সাথে আসতে গেলাম, বেচারারা... দেখতেও পারছে না ঠিক করে। ওরা অবশ্য বিন্দাস! বলল, চাপ নিস না, আমরা প্রতি সপ্তাহেই আসি।

সত্যি বলতে, আমি ছেলে হলে...যাক গে...

আমার প্রেমিকটি অবশ্য বেশ চুপ করে থাকে আমি সঙ্গে থাকলে। কারো সাথে তেমন কথা বলে না...

পার্টির শেষে বাড়ি ফেরার সময় আমার এক বন্ধু দেখালো, 'দেখ দেখ ঐ গাছটা, যেটা তোর ঘরের জানলা থেকে দেখা যায়, ওর সব পাতা লাল হয়ে গেছে। হেমন্তকালে এখানে এরকমটা হয়...'

পরদিন রোববার। সকালে কাথেড্রাল থেকে ফেরার পথে নদীর ধারে গিয়ে বসেছি। ডায়েরি লিখছি। এক ভদ্রলোক এলেন। উনি মাছ ধরবেন। থাকেন নদীর উপরেই। একটা বোট -হাউজে। আমায় ডায়েরি লিখতে দেখে বললেন...'জানো, একটা সময়, ১৩০০-১৪০০ শতাব্দীতে, এই শহরে প্লেগ রোগ হয়েছিল। (আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা!) অনেক অনেক লোক প্রাণ হারিয়েছিল। সেই সময়ে একটি মেয়ে, নাম জুলিয়ান, ঐ রোগে আক্রান্ত অবস্থায় লিখতে শুরু করে এবং কিছু বছর পরে একটা বই প্রকাশ করে। ঐতিহাসিকদের কথায়, জুলিয়ানই বিশ্বের প্রথম নারী যে ইংলিশে বই লেখে'।

শুনে বেশ অন্যরকম লাগল আমার... আমি আরো জানতে চাইলাম।

উনি বললেন, এই যে রিভারসাইড পাব-টা...এর নাম কী, জানো? আমি দেখে বললাম, 'Queen of Icini'। বলতে গিয়েই মনে পড়ল...আইসিনি ছিল প্রথম প্রজাতি যার নরউয়িচে থাকতে শুরু করে। তারপর উনি বললেন... 'এটা ৬০ অব্দের কথা... আইসিনিরা যখন এখানে রাজত্ব করত... আইসিনিদের রাণী ছিলেন এক অত্যন্ত সাহসী মহিলা। তিনি রাজার মৃত্যুর পর একাই পুরো রাজ্যটাকে চালাতেন। রোমানরা এখানে হামলা করার পর রাণী এবং তাঁর দুই সন্তানকে ধর্ষণ করে... তবুও রাণী কখনো থেমে থাকেননি। তিনি নিজের দল গঠন করে রোমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। শেষ অবধি রক্ষা না করতে পারলেও, হতিনি রোমানদের হাতে আত্মসমর্পণ করেননি কোথাও। শেষে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তোমায় দেখে আমার এঁদের কথা হঠাৎ মনে হল'।

তারপর উনি মাছ খুঁজতে চলে গেলেন।

আমার চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজেকে গর্বিত মনে হল, এই শহরটাকে নিয়ে...

ঘরে ঢোকার জাস্ট আগে, এক বয়স্ক ভদ্রলোককে বেরোতে দেখলাম... কত হবে বয়স? এই ৬০-৬৫ তো বটেই...গ্রে স্যুট, টাই, মাথায় হ্যাট, হাতে লাঠি... মর্নিং ওয়াকে বেরোচ্ছেন... সঙ্গে তাঁর স্ত্রী... তিনিও বেশ বয়স্ক... অথচ সাদা টপ, লাল জ্যাকেট আর লাল স্কার্ট পরে দিব্যি হাতে হত মিলিয়ে চলেছেন দুজনে। আমার আমাদের দেশের বয়স্ক মানুষগুলোর হাল মনে পড়ল!

আমায় দেখতে পাননি বলে আলতো ধাক্কা লেগে গেল।

তিন-চারবার স্যরি আর গুনে ৫বার থ্যাঙ্ক ইউ বললেন ওনারা। আমি তো অবাক, হল কী? এখানকার লোকেরা এতই ভদ্র, আর এতবারই স্যরি আর থ্যাঙ্ক ইউ বলে... নিজকেই ছোট মনে হয়। ইন্ডিয়া হলে নির্ঘাত বলতাম, আরে ধুর মশাই, ঐ শব্দগুলো কি আপনের লজ্জ নাকি?!

ধীরে ধীরে, শুনে শুনে আমাদেরও এই শব্দগুলো লজ্জ হয়ে গেল...

তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা এমনিই ঘুরছি এদিক-ওদিক, দেখলাম বেশ কিছু ছেলেমেয়ে অদ্ভুত সেজে খিলখিল করে হাসতে হাসতে কোথায় যেন যাচ্ছে...একজনকে ওদের মধ্যে জিজ্ঞেস করাতে জানালো, ওরা সব নাট্য-কুশলী... আমি তো দে-ছুট ওদের পেছনে। গিয়ে দেখি, বেশ বড়সড় একটা নাটকের জায়গা। নাম-নরউয়িচ থিয়েটার রয়্যাল।

নাটক শুরু হওয়ার আগেই হল পুরো ভর্তি। এবং সবচেয়ে অবাক ব্যাপার, সব্বাই সব্বাই আমারই বয়েসী। পাশের একজনের সাথে আলাপ হল, গল্পও। সে বলল 'Norwich is one of the most culturally sound cities of england.'

তারপর সে বলল, পাপেট থিয়েটার -এর কথাও। এখানকার অ্যাট্রাকশনের মধ্যে অন্যতম।

নাটকটাও বেশ প্রেমের...অন্যরকম! সব প্রেমই আসলে অন্যরকম...

হেমন্ত শেষের দিকে, একদিন আমার প্রেমিক একবার একা একা দেখা করার প্রস্তাব দিল। একটা বেশ পুরোনো কাঠের পাব-এ বসা হল। এথনিক ব্রিটিশ স্ট্রাকচার। পারফেক্ট ব্রিটিশ কায়দায় কথা বলে প্রতিটি ওয়েটার। প্রথম প্রথম এদের ভাষা আমি কিছুই বুঝতাম না...কিন্তু ততদিনে সয়ে গেছে। এত মদের ভ্যারাইটি দেখে, প্রত্যেকটা মদ্যপ্রেমী বন্ধুকে খুব করে মনে পড়ল আমার।

ও একটা স্কচ, আর আমি একটা রোজ ওয়াইন নিলাম। ছোট সিপ মারতে মারতে নিরিবিলি একটা ঠেকে বসে...কথা হল। এমনিই। ভবিষ্যতের কথা। বিয়ের পর কী প্ল্যান... বৃত্তান্ত। চোখ মোছা হল টুকটাক দু'তরফাই। শুধু প্রশ্ন করল না কেউ কাউকে কিছু। একটা সময়ের পর আর কোনো কথা খুঁজে পেলাম না কেউ।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ বলল, 'আমার ফিরে যাওয়ার দিন এসে গেছে। তাই একবার না কথা বললে, কেমন লাগত।' আমি বললাম, ফেরা কবে?

বলল...আগামীকাল!

সেদিন রাতে হঠাৎ বেশ টুপটাপ আয়াজ শুনে, ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, চারিদিকে বরফ পড়ছে। আমার জীবনের প্রথম দেখা স্নো! মনে হল, স্বপ্ন দেখছি... সারারাত চলল বরফ-বৃষ্টি... সকালে উঠে দেখলাম, আমার জানালার পাশের গাছটায় আর একটা পাতাও নেই...ন্যাড়াগাছ...শুধু সাদা সাদা বরফ লেগে আছে গায়ে... আমার বন্ধুরা বলল... এখানে, এরকমই হয়...

সবাই ঘুম থেকে ওঠার আগেই, স্নান সেরে, আমি আমার বহুদিনের শখের সাদা গাউনটা পরলাম। যদিও বেশ ঠান্ডা... রাস্তা স্লিপারি হওয়ারও চান্স আছে, তাও...

বাস নিলাম একটা... ২০ মিনিটের জার্নি...ইয়ারমাউথ বীচ... এত সুন্দর বীচ, ঠিক যেমনটা শেকসপীয়ার ইন লাভ-এ দেখিয়েছিল... তাতে আবার টুকরো টুকরো বরফের কুচি... হরিণের মতো ছুটে বেড়ালাম এদিক-ওদিক অনেকক্ষণ...

তারপর একটু আলো কমে এলে, দোয়াত কলম নিয়ে বসলাম...

...সুনীলদা বলেছিলেন... 'প্রথমে প্রেমটা করো, তা ভাঙুক, তবে না কবিতা লিখবে!'

সুনীলদা... ঠিকই বলতেন!